সংবাদ পরিষেবা | ফেব্রুয়ারি ২০২১

কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক, এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম-ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

নিরর্থক কৃষি বাজেট

২৬/০৮

বাজেট পেশ হল ১ ফেব্রুয়ারি। বাজেট হল দেশের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের আগামী এক বছরে লেখাজোখা। পরে, বছর ধরে বিভিন্ন কারণে হিসেবের নানারকম পরিবর্তন হয়। সেইসব কারণ এবং পরিবর্তনের বিবরণ নিয়ে বাজেটের ঠিক আগেই প্রকাশিত হয় চলতি বছরের আর্থিক সমীক্ষা। এই সমীক্ষা এবং বাজেটে নানা পরিসংখ্যান দেওয়া থাকে। ঠিক আগে বা বাজেট পেশের সময় সরকার পক্ষ, অর্থমন্ত্রী নানারকম ভালো ভালো কথা বলেন। সেগুলি কথার কথা। বাস্তবে পরিসংখ্যান দেখে, সেই সব সংখ্যার কাটাছেঁড়া করে, বাজেটের ভালোমন্দ বিচার করা করা দরকার। এ লেখায় সেভাবেই কৃষি বাজেট দেখে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর যেসব ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যা নেই, সেই বিষয়গুলি আমরা এখানে উল্লেখ করিনি। এছাড়া চাষের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে দেশের ত্রিশ লক্ষ কোটির বাজেটে, কৃষির জন্যে বরাদ্দ থাকে দেড় লক্ষ কোটি টাকা। গত বছর ছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা। এবারের তথাকথিত 'কৃষি বান্ধব' বাজেটে তা কমিয়ে করা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বারবার বলেছেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিয়ে এ বছরে কত কত চাল, গম, ডাল কেনা হয়েছে। কিন্তু এইসব সংখ্যার সঙ্গে বাজেটের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ এগুলি সরকার কেনেনি। কিনেছে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া বা এফসিআই, ধার নিয়ে। আর এফসিআই কে সরকার যে সাহায্য দেয়, তাও এবছর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পিএম কিষান যোজনা, সরকারের একটি প্রধান প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২ হেক্টর অবধি জমি যে চাষিদের রয়েছে, তাদের ৩ কিস্তিতে বছরে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়। চলতি বছরে এই প্রকল্পে বরাদ্দ ছিল ৭৫ হাজার কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে তা কমিয়ে করা হয়েছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা। যদিও এখনো সরকার অর্ধেক কৃষকের কাছেও পৌঁছতে পারেনি।

পিএম আশা, যার মাধ্যমে সরকার নিজে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি দিয়ে ফসল কিনে নেয়। এক্ষেত্রে কখনো নির্দিষ্ট কিছু ফসলের জন্য অতিরিক্ত দামও দেয়। এতে চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া নিশ্চিত হয়। গত বছর এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। আর এবছর কত হয়েছে জানেন? ৪০০ কোটি টাকা।

চাষের বাজার বিষয়ক মার্কেট ইন্টারভেনশন স্কিম এবং প্রাইস সাপোর্ট স্কিম এর ক্ষেত্রে এবছর বরাদ্দ ছিল ২০০০ কোটি টাকা। এই অর্থের অর্ধেকও সরকার খরচ করতে পারেনি। ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে এখাতে বরাদ্দ কমে হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা।

মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা প্রকল্পে চলতি বছরের যা বরাদ্দ করা হয়েছিল, ২০২১-২২ সালেও একই রাখা হয়েছে।

২০২২ সালের মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে বাজেট অধিবেশনে কৃষিমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে কৃষি পরিবারগুলির গড় আয় কত ছিল ? মন্ত্রী বলেন, এই আয় সম্পর্কে কোনো তথ্য সরকারের কাছে নেই। এছাড়া এই আয় কতটা বেড়েছে তার কোনো হিসেব এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়নি। তবে বাজেটে বলা হয়েছে, যে সব ফসল ন্যূনতম সহায়ক মুল্যে কেনা হয়, সেগুলির উৎপাদন খরচের দেড় গুণ বেশি দাম যাতে চাষিরা পায় তা নিশ্চিত করবে

সরকার। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ক্ষেত্রে স্বামীনাথন কমিশন বলেছিল, ফসলের উৎপাদন খরচের সঙ্গে পারিবারিক শ্রম, জমির ভাড়া, বিমার খরচ ধরে ন্যূনতম সহায়ক মুল্য ঠিক করার কথা। এই হিসেবে এখন ১ কুইন্ট্যাল ধানের দাম হবে প্রায় তিন হাজার টাকা। তবে সরকার সেই হিসেবে ন্যূনতম দাম ঠিক করবে কিনা, তা বলা হয়নি।

দেশের গ্রামীণ পরিকাঠামোর খুবই দূরাবস্থা। এতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি। গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে দেশে ৬০ শতাংশ শ্রমিক লাভবান হত। লাভবান হত বহু প্রান্তিক এবং ছোট চাষি। কিন্তু সরকার এই ক্ষেত্রে কোনো নজরই দেয় না। এবছর গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ ৩০ হাজার কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। তবে মাথায় রাখতে হবে এটা তহবিল। তহবিল হলেই যে তা খরচ হবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কারণ এটা সরাসরি বরাদ্দ নয়। এক্ষেত্রে খরচ করতে হলে, প্রজেক্ট তৈরি, অনুমোদন, অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি করে কাজ করতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। যার জন্য এইসব তহবিলের পরিমাণ বাড়লেও তা খরচ হয় না।

আপনারা হয়তো জানেন, গত বছর বাজেট পেশের সময় ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড বা কৃষি পরিকাঠামো তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এখনো অবধি সেই তহবিলের মাত্র ২৯৯০ কোটি টাকার প্রকল্পের চুক্তি হয়েছে। কোনো টাকা এখনো অবধি এইসব প্রকল্পের জন্য দেওয়া হয়নি। এর অর্থ হল, এক বছরে কোনো কাজ শুরুই হয়নি। এই তহবিল থেকে সরকার খরচ করেছে মোটে ২০০ কোটি টাকা যার মধ্যে বেশিরভাগটাই প্রশাসনিক খরচ। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কৃষি পরিকাঠামো তহবিলে ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

কৃষি পরিকাঠামো নির্মাণ তহবিলে অর্থ সরবরাহের জন্য, মদ এবং আমদানি করা হয় এমন ফল, ডাল ইত্যাদির ওপর একটি সেস বা উপকর বসানো হবে বলে এই বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া পেট্রল ও ডিজেলে লিটার প্রতি যথাক্রমে আড়াই এবং চার টাকা হিসেবে এই সেস বসানো হবে। আমরা জানি, চাষে এবং কৃষিপণ্য পরিবহনে পেট্রল ডিজেলের অনেকটা ব্যবহার হয়। ফলে বোঝা যাচ্ছে, চাষিদের পকেট কেটেই কৃষি পরিকাঠামো নির্মাণ তহবিলে অর্থ সরবরাহ হবে। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো আর কি।

২০২০-২১ অর্থবর্ষে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছিল ৭৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু কোভিড অতিমারির কারণে সরকার ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি খরচ করেছিল। এবছর এ খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। কোভিড পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি। আবার দ্বিতীয় খেপে সংক্রমণ বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে যারা কাজকর্ম খুইয়ে ছিল, তাদের অনেকে কাজে ফেরেনি। তা সত্ত্বেও এই খাতে অর্থ বরাদ্দ কমানো হয়েছে।

চলতি অর্থ বছরে ১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ ছিল ৬১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু লকডাউনের ফলে কাজ হারা শ্রমিকদের কাজ দিতে সরকার একপ্রকার বাধ্য হয়েছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ করতে। এই টাকা দিয়ে ১০০ দিন নয় গড়ে ৪৫ দিন কাজ দেওয়া গিয়েছিল। ২০২১-২২ বছরে এই প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা।

আপনারা জানেন, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা মূলত কৃষি এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো খাতে খরচ হয়। প্রায় সমস্ত অর্থনীতিবিদ বলছে, দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে গরীব, নিম্নবিত্ত, মানুষের হাতে অর্থ সরবরাহ জরুরি। একাজে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প একটি উপযুক্ত মাধ্যম। কিন্তু এই প্রকল্পে নাম মাত্র অর্থ বাড়ানো হয়েছে। অর্থশাস্ত্রীদের মতে, হাতে টাকা পেলে মানুষ তাদের দরকারি সামগ্রী কিনবে। ফলে চাহিদা বাড়বে। শিল্প সেই চাহিদা পূরণ করতে উৎপাদন করতে শুরু করবে। এতে অর্থনীতির চাকা ঘুরতে শুরু করবে এবং বৃদ্ধি স্বাভাবিক হারে হবে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।

বাজেটে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা কৃষি ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থ বর্ষে এই পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। এটা ঠিকই চাষিরা এই ঋণ পায়। কিন্তু এই ঋণের বেশিরভাগটাই পায় কৃষি এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে যুক্ত শিল্প এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। কারণ কৃষি ক্লিনিক, পরিকাঠামো, পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, বাজার তৈরি - এসবই কৃষি ঋণের আওতায় চলে আসে। এজন্য ৪ শতাংশ হারে ১০০ কোটি টাকা অবধি ঋণ পাওয়া যায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, শুধু মহারাষ্ট্রে ২০১৬ সালে ৬১৫টি অ্যাকাউন্টে ৫৮ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান।

২০২১-২২ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র কৃষিসেচ তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। চলতি বছরে এর পরিমাণ ছিল ৫ হাজার কোটি টাকা।

জলবায়ু বদলের ফলে চাষে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দ করা হয়নি। গত কয়েক বছর ধরে জিরো বাজেট বা শূন্য খরচের প্রাকৃতিক চাষে সরকার জোর দিয়েছিল। এ নিয়ে এবারে কোনো কথাই নেই বাজেটে। চাষে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বৈচিত্রময় চাষের প্রসারের মতো অন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও বাজেটে কোনো কথা বলা হয়নি।

কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত সবাই মনে করে কৃষিতে আরো বিনিয়োগ দরকার। এর দাওয়াই হিসেবে সরকার তাই নতুন তিনটি আইন এনেছে। 'মুক্ত' বাজারের নাম করে, এর মাধ্যমে, চাষিদের হঠিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর হাতে কৃষিক্ষেত্র তুলে দেওয়ার তালে রয়েছে সরকার। এনিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে পড়েছে সরকার এবং চাষিরা। এই বিরোধ কোন দিকে যায়, তার ওপরই নির্ভর করবে দেশের চাষের ভবিষ্যৎ বাজেট ।

সূত্রঃ পিআইবি | স্বরাজ ইন্ডিয়া, মতামত নিজস্ব

কৃষিঃ কেন্দ্রের লেখাজোখা ২৬/০৯

- ২০২০-২১-এ বাজেট বরাদ্দ ছিল ১,৩৪,৩৯৯.৭৭ কোটি টাকা যা দেশের মোট বাজেটের ৯.৩ শতাংশ। ২০১৯-২০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে মোট বাজেটের ৯.৬ শতাংশ টাকা বরাদ্দ ছিল। তবে বরাদ্দ থাকলেই তা খরচ হবে এমনটা নয়। আসলে কত টাকা খরচ হয়েছে তা মার্চ মাসের পরেই জানা যাবে।
- ২০১৫-১৬ তে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫১.৫৮ লক্ষ টন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ২৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা।
- চাষিদের থেকে ফসল সংগ্রহের পরিমাণ ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এই আর্থিক বছরে।
- 'প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি' যোজনার শুরুর থেকে এ পর্যন্ত উপকৃত হয়েছে ১০.৫৯ লক্ষ চাষি পরিবার।
- প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় শুরু থেকে এ যাবৎ ২৩ কোটি চাষি নথিভুক্ত হয়েছে।
- কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ২.৫ কোটি চাষি উপকৃত হয়েছে।
- দশ হাজার ফার্মার্স প্রড্যুসার্স অর্গানাইজেশন (এফপিও) বা কৃষি উৎপাদকদের ব্যবসায়িক সংস্থা গঠনের জন্য বাজেটে ৬,৮৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্রসেচ তহবিল গঠন বাবদ নাবার্ডকে ৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে এই তহবিল ব্যবহার করে এখনো কোনো সদর্থক কাজ করা হয়নি।
- দেশের ১৮টি রাজ্য এবং ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এক হাজারটি বাজারে ই-নাম পরিষেবা বা কৃষি সামগ্রীর বৈদ্যুতিন কেনাবেচার ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।
- বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের জন্য ৪৫.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যার প্রথম পর্যায়ে ১৯.৭০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেবে অনেক কিছু বলা আছে, যেমন মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কার্ড বিতরণের পরিমাণ বেড়েছে, জৈব চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, নিম যুক্ত ইউরিয়া প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু এরকম অনেক কিছুরই কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি।

সূত্রঃ পিআইবি

কৃষিঃ চাষির লেখাজোখা ২৬/১০

- ভারতে একজন চাষির গড় জমি রয়েছে ১.০৮ হেক্টর। এই জমির ফসল আট জনের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করে।
- এদেশের ছোট ও প্রান্তিক চাষি, মোট চাষির ৮৩ শতাংশ। আর তারা চাষ করে মাত্র ৪২ শতাংশ জমি।

- চাষির বড় দুটি দায় রয়েছে। তারা নিজেদের পরিবারকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আর দেশের মানুষ, পশু পাখির খাবার জোগায়।
- ভারতে খাদ্যের নিরাপত্তা তৈরি হয়েছে এইসব চাষিদের পরিশ্রমে। গত পাঁচ বছর ধরে বাম্পার ফসল ফলাচ্ছে এদেশের চাষিরা।
- মহামারিতে যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার তলানিতে এসে ঠেকেছে, তখন দেশে ফসল উৎপাদনে রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে চাষিদেরই হাত ধরে।
- দেশের অগণিত চাষি ২০.১৩ লক্ষ কোটি টাকার অর্থনীতি তৈরি করেছে। অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় এখনো কৃষিকাজ করে।

বঞ্চিত চাষি ঃ গত কয়েক বছর ধরে চাষিরা রাস্তায়। আপনি হয়তো কখনো 'জয় জওয়ান জয় কিষান' স্লোগান দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ভেবেছে কেন চাষিরা রাস্তায়? চাষিরা ২০২০ সালে ২২টি রাজ্যে ৭১ বার রাস্তায় নেমেছে, কখনো ফসলের দাম না পাওয়ার জন্য। অথবা চাষে নানারকম দমন মূলক নীতির জন্য।

জাতীয় গড় উৎপাদনে চাষিদের অংশ ক্রমশ কমছে। সেজন্য নীতিকারদের কাছে তারা ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। নেতাদের ধারণাও একই। কিন্তু চাষের ওপর নির্ভরশীল পরিবারের সংখ্যা এখনো বাড়ছে। পাঁচের দশকে জাতীয় গড় উৎপাদনে চাষিদের অংশ ছিল ৫১ শতাংশ। এখন তা কমে হয়েছে ১৬ শতাংশ। অপরদিকে ১৯৫১ সালে ৭ কোটি চাষি পরিবার এবং ২.২ কোটি খেতমজুর চাষের কাজে যুক্ত ছিল। আর এখন চাষ করছে ১২ কোটি চাষি পরিবার এবং ১৪.৪ কোটি খেতমজুর।

ঋণে জর্জর চাষি ঃ পরিসংখ্যান বলছে, ভারত বিশ্বের দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি। এ নিয়ে আমরা যথেষ্ট উৎসাহিত। কিন্তু এই বিকাশের ছিটেফোঁটা চাষিদের কপালে জুটেছে কি? উত্তর হল না। কারণ দেশে দুজন চাষির মধ্যে একজন ঋণগ্রস্ত। এদেশে একজন চাষির মাসিক আয় ৬৪২৬ টাকা আর ব্যয় ৬২২৩ টাকা। দেশের মাত্র ১৫ ভাগ চাষি কৃষি থেকে মোট আয়ের ৯১ শতাংশ পায়। এরা মূলত বড় চাষি। ফলে চাষিদের মধ্যেই রয়েছে আয়ের বিরাট বৈষম্য। বৈষম্য রয়েছে অন্য পেশার লোকেদের সঙ্গেও।

বেশিরভাগ চাষিদের হাতে বাজার থেকে জিনিসপত্র কেনার জন্য বিশেষ কিছু পড়ে থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যা কেনে, তা দেশের জাতীয় গড় উৎপাদনের ৯০ শতাংশ। কারণ দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ পরিবার কৃষি এবং তার আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত। এর অর্থ হল, দ্রুত বিকাশশীল দেশের অর্থনীতির ধ্বজা চাষিরাই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এই বিকাশ কি সুস্থায়ী হবে? উত্তর হল না। কারণ চাষিদের আর্থিক অবস্থা যত খারাপ হবে অর্থনীতিও তত ভঙ্গুর হয়ে যাবে।

জলবায়ু বদলের মার ঃ দেশে ২০১৯ সালে, কৃষিকাজে যুক্ত প্রায় দু'জন লোক প্রতি ঘণ্টায় আত্মহত্যা করেছে। ভারতে মোট আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে ৪.৮ শতাংশ ঘটেছে চাষিদের মধ্যে থেকে। জলবায়ু বদল চাষিদের ওপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলছে। সরকারি তথ্য বলছে, জলবায়ু বদলের ফলে চাষিদের আয় ২৫ শতাংশ অবধি কমতে পারে। দেশের ১০০টি দরিদ্রতম জেলা জলবায়ু বদলের ফলে খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই জেলাগুলি চাষের ওপরই নির্ভরশীল। এজন্য প্রতি বছর ৭০০ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে।

খরা, কৃষিকাজে বিশেষত বৃষ্টি নির্ভর চাষে প্রবল ক্ষতি করছে। ২০০৯ থেকে ২০১৯ অবধি খরা প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। এদেশে ৫০ শতাংশেরও বেশি চাষি বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে চাষ করে। জলবায়ু বদলের ফলে খরা, বন্যা প্রতি বছর ৩০ কোটি চাষির জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

চাষির আয় কমছে ঃ ২০১১ সালের জন গণনা অনুসারে প্রতিদিন ২ হাজার চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিচ্ছে। পরিবারের মোট আয়ে ইতিমধ্যে কৃষিকাজ থেকে আয় হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭০ সালে গ্রামীণ পরিবারের চার ভাগের তিন ভাগ আয়ের উৎস ছিল কৃষিক্ষেত্র। ২০১৫ সালে, প্রায় ৪৫ বছর পর, তা তিন ভাগের এক ভাগেরও কম হয়েছে। বেশিরভাগ পরিবার এখন অকৃষি কাজ থেকে বেশি আয় করছে। বর্তমানে একজন দিন মজুরও চাষির থেকে বেশি আয় করে।

সূত্রঃ ডাউন টু আর্থ

মাছ ও পশু পালনের স্কুল ২৬/১১

আইসিএমআর - সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ফ্রেশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার এবং সোনারপুরের শস্য শ্যামল কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র অ্যাকোয়াকালচার ও লাইভস্টক ফার্মার ফিল্ড স্কুল নামে চাষিদের জন্য দুটি স্কুল শুরু করেছে। সম্প্রতি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সোনারপুর ব্লকে এই দুটি স্কুলের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই স্কুল দুটির মাধ্যমে আশেপাশের ২০টি গ্রামের পাঁচ হাজারের বেশি মাছ এবং পশু পালক উপকৃত হবে বলে জানিয়েছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র।

জন উদ্ভাবনের তথ্য ২৬/১২

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ভূ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে একটি উদ্ভাবন পোর্টাল জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরে স্বশাসিত সংস্থা ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাইন্ডেশন এই পোর্টালটি তৈরি করেছে।

এই পোর্টালটিতে কৃষি, স্বাস্থ্য ও পশু চিকিৎসা এবং স্থানীয় কারিগরি উদ্ভাবনের ১ লক্ষ ১৫ হাজারটি তথ্য আছে। এখানে বিদ্যুৎ, যন্ত্রবিদ্যা, গাড়ি, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সামগ্রী, রাসায়নিক সামগ্রী, বস্ত্র ও বয়ন, কৃষি, ফসল মজুত রাখা, পশুপালন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য রয়েছে। এখানে সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানীয় উদ্ভাবনের খবর তুলে ধরা যাবে।

জল শোধন করে চাষ ২৬/১৩

দুর্গাপুরের সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই প্রথম বর্জ্য জল শোধন বিষয়ে একটি মডেলের উদ্ভাবন এবং তার ব্যবহার শুরু করেছে। এর নাম তারা দিয়েছে অ্যাকোয়া রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট বা এআরপি। এই এআরপি'র সাহায্যে বর্জ্য জল সুসমন্বিতভাবে শোধন করে সেচ বা কৃষিকাজে ফের ব্যবহার করা যাবে। এআরপি বর্জ্য জলকে ৬টি স্তরের মাধ্যমে পরিশোধন করে তোলে। এটি ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ২৪ হাজার লিটার জল ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা সম্ভব। এই জল দিয়ে প্রায় ৪ একর জমি চাষ করা যাবে বলে সংস্থাটি মনে করছে।

প্রোটিনের উৎস পোকামাকড় ২৬/১৪

আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার প্রায় ১১৩টি দেশে, আদিবাসীরা ১৯০০ এরও বেশি প্রজাতির পোকামাকড় খায়। পোকামাকড়, মানুষের খাদ্য তালিকায় থাকা প্রাণীর থেকে অনেক কম গ্রিনহাউস গ্যাস ত্যাগ করে। এদের পালনের জন্য জমি এবং জল অনেক কম লাগে। খাদ্যও কম লাগে। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বা এফএও জানিয়েছে, প্রোটিনের উৎস হিসেবে পোকামাকড় খুব ভালো। এছাড়া ভিটামিন, ফাইবার এবং খনিজগুলির একটি দুর্দান্ত উৎস পোকামাকড়। এগুলিতে তাদের শুকনো ওজনের প্রতি ১০০ গ্রামের মধ্যে ৪০-৭৫ গ্রাম অবধি উচ্চমানের প্রোটিন পাওয়া যায়, যার ৭৬ থেকে ৯৬ শতাংশ হজমযোগ্য। পশ্চিমের বহুদেশ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পোকামাকড় উৎপাদন এবং তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার নীতিমালা তৈরি করছে। এফএও এখন পোকামাকড়কে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলছে। তবে সমস্যা হল অন্যখানে। বর্তমানে কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন যে রোগ মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে সেগুলি হল জুনটিক রোগ। এইসব রোগ পশু, পাখি, পোকামাকড় থেকে বিভিন্ন কারণে মানুষের শরীরে আক্রমণ করছে। এই অবস্থায় এফএও-এর প্রস্তাব কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়েও বিজ্ঞানী মহলে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ওই যে হলুদ ফল ২৬/১৫

হলুদ ফল বলতে আমরা কলা, আম, লেবু, আনারস প্রভৃতি বুঝি। এসব ফলে বায়ো-ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েড রয়েছে। তাই এগুলির স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। এদের মধ্যে অধিকাংশ ফলই আবার পুষ্টির আধার হিসেবে পরিচিত।

হলুদ ফল, বিশেষ করে কলা এবং লেবুতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার রয়েছে, যা খাবার হজম করতে সাহায্য করে। এই

ফলগুলি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি গলিয়ে দেয়। এতে হার্টের সমস্যা সহজেই এড়ানো যায়। হলুদ ফলে ভিটামিন-এ থাকায় তা দৃষ্টিশক্তির জন্য উপকারী। এই ফলগুলিতে ভিটামিন-সি থাকে। নিয়মিত এসব ফল খেলে তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়া ভিটামিন সি-এর সঙ্গে ভিটামিন-ই থাকায় তা ত্বককে মসৃণ এবং কোমল রাখতে সাহায্য করে। ত্বকের নানা সমস্যা বিশেষ করে ব্রণ দূর করে। হলুদ ফলে রেটিনল এবং ভিটামিন-এ১ থাকায় তা ত্বকের বলিরেখা দূর করে ত্বককে সুন্দর করে তোলে। তবে যাদের ত্বক অনেক বেশি সংবেদনশীল তাদের এই ফলে অ্যালার্জিও হতে পারে।

হলুদ ফল খেলে, এর ভিটামিন সি এবং ব্যাকটেরিয়া রোধী উপাদান, যে কোনো ক্ষত তাড়াতাড়ি ভালো করে তোলে। এ ফলে থাকা ভিটামিন-ডি এবং ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতের জন্য খুবই উপকারী, যা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে হাড় এবং মাংসপেশীকে শক্তিশালী করে।

হলুদ ফল কলায় প্রচুর কার্বোহাইড্রেট রয়েছে। এতে ওজন বাড়ে। এসব ফল বেশি খেলে হজমে সমস্যা দেখা দেয়। ডায়রিয়াও হতে পারে। গর্ভাবস্থায় আনারস খেলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকে। এই ফলগুলিতে বিটা ক্যারোটিন নামে একটি উপাদান রয়েছে, তাই হলুদ ফল বেশি খেলে ত্বকের রঙ হালকা হলুদ হতে পারে। ড. হেলথ বেনিফিটস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

ই-বর্জ্যে ডুবছে দেশ ২৬/১৬

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (সিপিসিবি)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ভারতের মোট বৈদ্যুতিন বা ই-বর্জ্যের মাত্র দশ শতাংশ সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল মাত্র ৩.৫ শতাংশ। সিপিসিবি-এর অনুমান, এদেশে ২০১৭-১৮ সালে ৭,০৮,৪৪৫, ২০১৮-১৯-এ ৭,৭১,২১৫ টন ই-বর্জ্য উৎপাদিত হয়েছে। সিপিসিবি-এর অনুমান ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এই বর্জ্যের পরিমাণ ৩২ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১০,১৪,৯৬১ টন। ই-বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার মনিটর, মোবাইল ফোন, চার্জার, মাদারবোর্ড, হেডফোন, টেলিভিশন সেট ইত্যাদি।

।। বিষমুক্ত সবজি বাগান পরিবারের পুষ্টির আধার ।।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০৪২ । দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ণ : অভিজিত দাস,
সম্পাদক : সুব্রত কুণ্ডু